বজ্রপাত যেন এক সাক্ষাৎ মৃত্যু

এম জসীম উদ্দিন

আলোর একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রূপ হচ্ছে গামা রশ্মি । মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সৃষ্টি হলে অথবা কোন তারা বিস্ফোরিত হলে, তখনই সাধারণত গামা রশ্মির উদগীরণ লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু ১৯৯৪ সালে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন গামা রশ্মি সৃষ্টি হচ্ছে পৃথিবী পৃষ্ঠের খুব কাছেই । তারা এটি চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার করেন কম্পটন গামা রে অবজারভেটরি স্যাটেলাইট। বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েই তারা আবিষ্কার করেন যে, গামা রশ্মির সঙ্গে বজ্রপাতের সংযোগ বা সম্পর্ক রয়েছে ।

বজ্রপাত একটি আকস্মিক ঘটনা এবং পুরোপুরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ দুর্যোগ প্রতিহতের উপায় নেই। বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা বিশ্বে বাংলাদেশেই বেশি। বজ্রপাতে বিশ্বের এক-চতুর্থাংশই মৃত্যুই ঘটে এ দেশে। ২৩ এপ্রিল ২০২৩ বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছয়টি উপজেলায় বজ্রপাতে একদিনে নয় জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছে আরও তিনজন। জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ায় বাংলাদেশে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে। চলতি বছরেও বজ্রপাতের তীব্রতা বেশি থাকতে পারে। এমনটি মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচতে সচেতনতার বিকল্প নেই বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। দেশে প্রতি বছর গড়ে ২৫০ জনের বেশি মারা যান বজ্রপাতে। বেসরকারি হিসাবে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি। প্রতিবছর মার্চ থেকেই শুরু হয় বজ্রপাত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বজ্রপাতে প্রাণহানি কমাতে জনসচেতনতা সবচেয়ে জরুরি। বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেতে করণীয় বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। বজ্রপাত থেকে রক্ষার বিভিন্ন উপায় আরও বেশি করে প্রচারের পরামর্শও দিয়েছেন তারা। ইতোমধ্যে বজ্রপাত থেকে বাঁচতে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতর ২০টি জরুরি নির্দেশনা দিয়েছে। নির্দেশনাগুলো হলো- বজ্রপাতের ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করা যাবে না। প্রতিটি বিল্ডিংয়ে বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। খোলাস্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে দূরে সরে যেতে হবে। কোনো বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সবাইকে এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে অবস্থান করতে। খোলা জায়গায় কোনো বড়ো গাছের নিচে আশ্রয় নেয়া যাবে না। গাছ থেকে চার মিটার দূরে থাকতে হবে। ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে থাকতে হবে। বৈদ্যুতিক তারের নিচ থেকে নিরাপদ দূতত্বে থাকতে হবে। ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্লাগগুলো লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। বজ্রপাতে আহতদের বৈদ্যুতিক শকে মতো করেই চিকিৎসা দিতে হবে। এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রপাত বেশি হয়। এই সময়ে আকাশে মেঘ দেখা গেলে ঘরে অবস্থান করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালা বা বারান্দা থেকে দূরে সরে যেতে হবে এবং ঘরের ভেতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকতে হবে। ঘন-কালো মেঘ দেখা গেলে অতি জরুরি প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরে বাইরে বের হওয়া যেতে পারে। উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি, তার, ধাতব খুঁটি ও মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে হবে। বজ্রপাতের সময় জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করতে হবে। বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, মাঠ বা উঁচু স্থানে থাকা যাবে না। কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা, জলাশয় থেকে দূরে থাকতে হবে। বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখতে হবে এবং নিজেরাও বিরত থাকতে হবে। বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠে থাকলে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে পড়তে হবে। বজ্রপাতের সময় গাড়ির মধ্যে অবস্থান করলে, গাড়ির ধাতব অংশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ যেন না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সম্ভব হলে গাড়িটিকে নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। বজ্রপাতের সময় মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করতে হবে।

আমাদের দেশে বজ্রপাতের শিকার মানুষদের বড়ো অংশ কৃষক, যারা সবার মুখে অন্ন তুলে দিতে মাঠে যান। আর সেখানেই মরে পড়ে থাকেন। অথচ বিশেষজ্ঞরা সব সময়ই বলে আসছে ঝড়-বৃষ্টিতে ঘরে থাকার বিকল্প নেই। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বেসকারি সংগঠন ‘ডিজাস্টার ফোরাম-এর তথ্যমতে, এদেশে প্রতিবছর গড়ে বজ্রপাতে ২৬৫ জনের মৃত্যু হয়। এর মধ্যে ৭০ শতাংশই মাঠে থাকা কৃষক, সাড়ে ১৪ শতাংশ বাড়ি ফেরার পথে, আর ১৩ শতাংশ গোসল কিংবা মাছ শিকারের সময়। তবে শহরের ভবনগুলোতে বজ্রপাত প্রতিরোধক দন্ড থাকায় হতাহতের সংখ্যা কম। ২০১১-এর শুরু থেকে ২০২২ পর্যন্ত ১২ বছরে দেশে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ১৬২ জনের। সাধারণত এপ্রিল ও জুনে বজ্রপাত বেশি হয়। মার্চ থেকে অন্তত তিন মাস বোরো আবাদে হাওড়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকে। ওই সময় বজ্রপাতে মৃত্যু বেশি ঘটে। এদিকে দেশের সবচেয়ে বেশি বজ্রপাতপ্রবণ এলাকা সুনামগঞ্জে হতাহত কমাতে বসানো হয়েছে ২৪টি বজ্রনিরোধক লাইটনিং অ্যারেস্টার।

বজ্রপাত থেকে মানুষকে রক্ষায় কৃষি মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রকল্প গ্রহণ করেছে । দুটি প্রকল্পের মাধ্যমেই বজ্রনিরোধক যন্ত্র স্থাপন এবং মোবাইল অ্যাপ, মোবাইল ভয়েস ও মোবাইল টেক্সট মেসেজের সাহায্যে বজ্রপাত আঘাত হানার আগে কৃষকসহ অন্যান্যদের সতর্ক করার সুযোগ থাকছে। একইসঙ্গে দুই মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত প্রকল্পেই জনসচেতনতার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ‘হাওরাঞ্চলে কৃষকদের জীবনের সুরক্ষায় বজ্রনিরোধক ব্যবস্থা স্থাপন’ শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ২৩১ কোটি টাকা। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৩০০ কোটি টাকা, এটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

বাংলাদেশে বজ্রপাতের মূল কারণ দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান। বাংলাদেশের একদিকে বঙ্গোপসাগর, এরপরই ভারত মহাসাগর। সেখান থেকে গরম আর আর্দ্র বাতাস আসছে। আবার উত্তরে রয়েছে পাহাড়ি এলাকা, কিছু দূরেই হিমালয় রয়েছে, যেখান থেকে ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে। এই দুই বাতাসের সংমিশ্রণ বজ্রপাতের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছে। চৈত্র-বৈশাখে কালবৈশাখীর মৌসুম শুরু হলেই বজ্রপাতের ঘটনা ঘটতে থাকে। বাংলাদেশে বজ্রপাতের সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি ঘটে ২০১২ সালে। ওই বছরের ১০ আগস্ট সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার জয়শ্রী ইউনিয়নের সরস্বতীপুর গ্রামের মসজিদে বজ্রপাতে ইমামসহ ১৩ জন মুসলির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। আর সারাবিশ্বে বজ্রপাতের সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি ঘটে ১৭৬৯ সালে। ইতালির একটি চার্চে বজ্রপাতে গান পাউডার বিস্ফোরিত হয়। এতে তিন হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

বাংলাদেশ সরকার ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করেছে। রাজধানীর আগারগাঁওয়ের আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্রের (এসএমআরসি) মতে, সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বজ্রপাতের সংখ্যা ও প্রাণহানির দিক দিয়ে সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে বাংলাদেশ। সার্কভুক্ত অন্য দেশের তুলনায় মৃত্যুর হারও বেশি। মার্চ থেকেই বাংলাদেশে বজ্রপাত শুরু হয় বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রতিবছর বজ্রপাতে অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটে। এর পেছনে নানা কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কারণ হচ্ছে বায়ুমন্ডলে অস্থিরতা সৃষ্টি। শীত মৌসুমে দেশে প্রত্যাশিত বৃষ্টিপাত হয়নি। শীত পরবর্তী সময়ে ছিল না স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত। আবহাওয়ার এমন অস্বাভাবিক অবস্থা বায়ুমন্ডলে অস্থিরতা সৃষ্টি করে বজ্রপাতের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। ঘূর্ণিঝড়ের মতোই ভয়ঙ্কর হতে পারে বজ্রপাত। একটি ঘূর্ণিঝড়ে যে সংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঘটে, বজ্রপাতের কারণে তার চেয়ে বেশি মৃত্যু ঘটতে পারে। গত ৬ বছরের পরিসংখ্যান তা প্রমাণ করে। ঘূর্ণিঝড়ে একই সময়ে একই জায়গায় অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটে থাকে। আর বজ্রপাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ক্ষতির শিকার হয়। তাই বজ্রপাতের ভয়াবহতা খুব বেশি মানুষের চোখে পড়ে না। ইউরোপ, জাপান ও আমেরিকায় এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা চলছে।

বজ্রপাত নিয়ে গবেষণায় থেমে নেই বিজ্ঞানীরা। বজ্রপাত থেকে উৎপন্ন বিপুল পরিমাণ তড়িৎ শক্তিকে ধারণ করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের বিষয়ে বিজ্ঞানীরা উৎসাহী হয়ে উঠেছেন এবং তা বাস্তবায়িত করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। বজ্রপাত থেকে উৎপন্নবিদ্যুৎ শক্তি জমা করতে পারলে একটি পরিবার ১৮৫ মাস বা, প্রায় ১৫ বছর বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবেন।

২০০৮ সালে সুইডেনে অনুষ্ঠিত ২৯তম ‘ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন লাইটিং প্রটেকশন’ শীর্ষক সম্মেলনে তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক কলিন প্রাইস তার ‘থান্ডারস্টর্ম, লাইটিং এ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ’ শীর্ষক গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। সেই গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, বায়ুদূষণ তথা পরিবেশ দূষণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বজ্রপাতের। বজ্রপাতে একদিকে যেমন বায়ুদূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি বেড়েছে পরিবেশে বজ্রপাতের হার ও তীব্রতা। বর্তমানে আবহাওয়া অধিদফতরের সাপ্তাহিক ও দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস তালিকায় নতুন যুক্ত হয়েছে বজ্রঝড়।

বজ্রপাতের তাপমাত্রা থাকে ৪০ হাজার ডিগ্রী সেন্ট্রিগ্রেট। ঘণ্টায় প্রায় ২লাখ ২০ হাজার কিলোমিটার গতিবেগ থাকে। বজ্রপাতের দৈর্ঘ্যে ১‘শ মিটার থেকে ৮ কিলোমিটার, ব্যাসার্ধে ১০ থেকে ২৫০ মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এতে ১০ কিলো থেকে ১ কোটি পর্যন্ত ভোল্ট থাকে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য বজ্রপাত প্রাকৃতিক চার্জ হিসেবে কাজ করে। বিশ্বে প্রতি সেকেন্ডে ৪০ থেকে ১০০ টি বজ্রপাত হয়। ২০১২ সালে জার্মান বিজ্ঞানীদের প্রকাশিত এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে পৃথিবীর উপরিতলের তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়েছে। এতে বজ্রপাতের ঝুঁকিও বেড়েছে ৪০ শতাংশ।

আবহাওয়া বিজ্ঞানে বলা হয়, গ্রীষ্মকালে দিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে বাতাস গরম হয়ে উপরে উঠতে থাকে। জলীয়বাষ্পও উপরে উঠে আর মেঘের ভিতর যত বেশি পরিমাণে জলীয়বাষ্প ঢুকবে তত বেশি উষ্ণ মেঘের সৃষ্টি হবে। এ সময় ‘আপ ড্রাফ’ এবং ‘ডাউন ড্রাফ’ বাতাসে চলতে থাকে। একে বলা হয় বজ্রমেঘ। মেঘের উপরের অংশে পজেটিভ এবং নিচের ও মধ্য অংশে নেগেটিভ বিদ্যুত তৈরি হয়। পজেটিভ ও নেগেটিভ মেঘের ভিতরের বিদ্যুত আঁধারে দূরত্ব বেড়ে গেলে প্রকৃতির নিয়মে ভারসাম্য আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পজেটিভ ও নেগেটিভ মেঘ থেকে বিদ্যুৎ আদান-প্রদান শুরু হয়। পজেটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎ সঞ্চালন শুরু হলে বজ্রের সৃষ্টি হয়। আর তখনই বজ্রপাত হতে থাকে।

বজ্রপাতে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচা খুবই কঠিন। তবে সতর্ক হলে মৃত্যুর সংখ্যা কমানো যেতে পারে । তাই আসুন বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচতে আবহাওয়াবিদদের পরামর্শ মেনে চলি, নিজে বাঁচি অন্যকে বাঁচাই।

#

লেখক: তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার